পায়েল সেনের গোয়েন্দাগিরি

মৌসুমী দত্ত

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূমিকা

পায়েল সেন একজন স্বনামধন্য প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সাতাশ বছর বয়সের এই তরুণীর ক্ষুরধার বুদ্ধি, শাণিত বিশ্লেষণ ও এক্স-রে দৃষ্টির কাছে বাঘা-বাঘা পুলিশ অফিসার মাথা নত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি চলে তাঁর শখের গোয়েন্দাগিরি। পায়েলের অ্যাসিস্ট্যান্ট অনামিকা সেন, খুড়তুতো বোন, বিজ্ঞাপন জগতের একজন নামী মডেল।

গোয়েন্দা-সাহিত্যে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর পায়েল সেন-এর আবির্ভাব এক সাড়া-জাগানো ঘটনা। বহু তদন্তের কাজ সুনিপুণভাবে সমাধান করে পায়েল সেন এখন একজন প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধানকারী।

পায়েল সিঙ্গল মাদার, পাঁচ বছরের ছোট্ট তোজোকে একটি অনাথ আশ্রম থেকে দত্তক নিয়ে মানুষ করছেন। আদি নিবাস বর্ধমানে, কর্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা। পায়েল ক্যারাটে জানেন, রিভলভার রাখেন। পায়েল সেন লালবাজারের স্পেশাল আই.জি. প্রতুল গুপ্তের স্নেহধন্যা, তিনি মাঝেমধ্যেই পায়েলের কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। পায়েল অপরাধ বিজ্ঞান, ফরেন্সিক সায়েন্স, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, স্কিন অ্যানাটমি, ফিজিওলজি— সবকিছু নিয়েই চর্চা করে থাকেন।

সূচিপত্র

আড়াই প্যাঁচ	১১
কে ছিল অন্তরালে	৩১
ডাঃ রায়ের অন্তর্ধান রহস্য	৪৬
বই চুরি	৬৭
ব্রায়োফাইট	৭৬
মুখার্জি ভিলা	৯০
সমুদ্র সৈকতে	১০৯
সিঁদুরে লাল রাফেল	১২৭
স্মরগরল	১৪৬

◆ আড়াই প্যাঁচ ◆

“মালতীও কাজ ছেড়ে চলে গেল রে পায়েল, ও নাকি ফিনাইল চুরি করেছে। সবজিপাতি, তেল, সাবান এসব হলে না হয় কথা ছিল, তাই বলে ফিনাইল? এই নিয়ে তিনজন হল।”

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতেই ব্যাজার মুখে খবরটা দিল অনামিকা।

সত্যিই সমস্যার ব্যাপার। ওদের পাশের ফ্ল্যাটের সোমা বউদি এদিক-ওদিক থেকে খুঁজে খুঁজে কাজের লোক জোগাড় করে দিচ্ছেন, আর ঠাম্মা ঝগড়া করে তাকে বিদেয় করছেন।

“হাউজিং কমপ্লেক্সের কোনো কাজের লোক এবার আর আমাদের বাড়িতে কাজ করবে না বুঝলি। আমি দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছি ঠাম্মাকে”, অনামিকা রাগে গজর গজর করতে থাকে।

আজ মাসখানেক হল ঠাম্মাকে ডাক্তার দেখাতে বর্ধমান থেকে কলকাতার ফ্ল্যাটে এনে রেখেছে পায়েল। আর্থারাইটিসে ভুগছেন ঠাম্মা, কিন্তু কলকাতায় এসেই ডাক্তারবাবুর নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি রামরাজত্ব চালাতে শুরু করেছেন।

সেই কাকভোর থেকে শুরু হয়ে যায় তাঁর দাপাদাপি, তোজোর পেছনে ছুটে বেড়ানো, দিনভর কাজের লোকের পেছনে খিটখিট, সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে পায়েলকে জোর করে বড়ো এক গ্লাস দুধ গেলাবেন। এত্তো এত্তো ফল কেটে টিফিন বক্সে ঠেসে ঠেসে ভরে ব্যাগে পুরে দেবেন। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরলে ব্যাগ চেক। এক টুকরো ফলের কুচি পড়ে থাকলে কী হম্বিতম্বি!

‘খাসনি কেন? গায়ে জোর না হলে রিভলভার চালাবি কী করে?’

অনামিকা একটু রাত করে পড়াশোনা বা কাজকর্ম করলেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে এসে লাইট অফ...!

‘রাত জেগে জেগে চোখেমুখে কালি পড়ে গেলে তোমার মডেলিং শিকেয় উঠবে!’

“আহা রে ঠাম্মা,” পায়েলের গলার কাছে একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠে, “এই অনি, ঠাম্মাকে কিছু বলবি না, বয়সজনিত কারণে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন... নিজেকে সংসারে অপাঙক্তেয় ভাবছেন বলেই এমন সব কাজকর্ম করা শুরু করেছেন। ভেবে দেখ, ঠাম্মা কত কুসংস্কারমুক্ত

উদার মানসিকতার মানুষ। ‘মাতঙ্গিনী হাজরা’ ওঁর আদর্শ, ছোটোবেলায় লুকিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরাকে দেখতে ছুটে গেছিলেন ঠাম্মা। দৌড়াতে গিয়ে কাঁটাঝোপে শাড়ি আটকে সে কী রক্তারক্তি কাণ্ড!”

ঠাম্মার এরকম কত গল্প কতবার শুনেছে পায়েল। আজ সেই ঠাম্মা খিটখিটে, বাতিকগ্রস্ত; দিনরাত্রি অহেতুক কাজের লোককে সন্দেহ করে চলেছেন।

নাহ্, ঠাম্মাকে একজন সাইকায়াট্রিস্ট দেখাতে হবে।

***

তোজো ‘ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথস অলিম্পিয়াড’-এ প্রথম ধাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এইবার দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা। এবার উত্তীর্ণ হলে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য দিল্লি ছুটতে হবে। জোরকদমে তার প্রস্তুতি চলছে। পায়েল অনেক কসরত করে প্রিভিয়াস ইয়ারের ‘অ্যালান’, ‘ট্যালেন্টো’-র কোয়েশ্চেন কালেক্ট করে এনে সেগুলোকে সলভ করাচ্ছে তোজোকে দিয়ে। এখন ওর চোখদুটো সামনে খোলা ল্যাপটপের স্ক্রিন আর পাশে বসা তোজোর কপির দিকে সমানে ঘোরাফেরা করেছে। ঘাড় গুঁজে তোজো অঙ্ক কষে চলেছে, ও জানে ট্যাঁ-ফো করে কোনো লাভ হবে না।

একটা ঘটনা পায়েলকে খুব ভাবাচ্ছে। গত তিন বছরে ভারতে যত কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড এবং অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে, সেসব ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ একটা পিডিএফ ফাইল বানিয়ে ল্যাপটপে সেভ করে রেখেছে পায়েল।

এর মধ্যে ‘শীনাবরা হত্যা’, ‘কঙ্কাল কাণ্ড’, ‘দুর্গাপুরের মা ও শিশু কন্যার খণ্ড খণ্ড দেহ সুটকেস বন্দি’, ‘দিঘার সি-বিচে মা-মেয়েকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা’— এই সব চাঞ্চল্যকর ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যেসব ছোটো-বড়ো খুনের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে গেছে, সেগুলোও পায়েল ফাইলবন্দি করে রেখেছে।

আরে, এই তো পাওয়া গেল, যেটা ও খুঁজছিল।

গত বছর ব্যাঙ্গালোরে পূজা নামে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সি একটি বাঙালি মেয়ের দেহ সুইমিং পুলের ধারে পাওয়া যায়। শ্বাসরোধে মৃত্যু, আততায়ী কোনো দড়ি বা তার জাতীয় কিছু গলায় পেঁচিয়ে ওকে হত্যা করেছিল। ওই ঘটনাটির কোনো সুরাহা হয়নি।

তখনই ওর ফোনটা বেজে উঠে, মোবাইল স্ক্রিনে নাম ফুটে উঠল— ‘বাবা’।

এই তো আজ দুপুরে লাঞ্চ আওয়ারে বাবার সঙ্গে ঠাম্মার অসুখ আর ডাক্তারের ব্যাপারে ফোনে অনেকক্ষণ কথা হল, এখন আবার ফোন?

পায়েল উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলে, "কী ব্যাপার বাবা? তোমরা সবাই ভালো আছ তো?"

"হ্যাঁ রে মা, সবাই ভালো আছি। তোদের খবর ভালো তো?"

"হ্যাঁ, ভালো।"

"তোর কি দীপককে মনে আছে? আমাদের বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া থাকতেন?"

"খুব মনে আছে। দীপককাকা, পূবালীকাকিমা তো। ওনাদের একমাত্র মেয়ে উজ্জয়িনী, ডাকনাম রিকু। কী সুন্দর পুতুল পুতুল দেখতে!"

"ওই রিকু খুন হয়ে গেছে।"

চমকে ওঠে পায়েল, "রিকু খুন হয়ে গেছে?"

***

পায়েল যখন ক্লাস ফোরে পড়ে, ওদের বর্ধমানের বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া আসেন এক নবদম্পতি। অবশ্য খুব অল্পদিনের মধ্যেই দু'পক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে, ওই নবদম্পতি পায়েলদের বাড়ির একরকম সদস্যই হয়ে ওঠেন বলা চলে। বাড়িতে ভালোমন্দ রান্না কিছু হলেই নিচের তলায় চালান হত। দীপককাকা, পূবালীকাকিমার ঘরে পায়েল-অনামিকার ছিল অবাধ গতি। একদিন তো হঠাৎ পূবালীকাকিমা একটা ছোট্ট নরম তুলতুলে বার্বি ডল নিয়ে নার্সিং হোম থেকে ফিরলেন। সেটাকে নিয়ে কী প্রবল উত্তেজনা দুই বোনের! সারাদিন ওই একরত্তি পুঁচকেটার সঙ্গে লেপটে থাকত। তখনও অনামিকার ভাই গোবলুর জন্ম হয়নি। ইতিহাস বইতে গুপ্তবংশের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী 'উজ্জয়িনী' নামটা পায়েলের খুব পছন্দ ছিল। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর পায়েল বার্বি ডলের নাম রাখল 'উজ্জয়িনী'। 'রিকু' ডাকনামটা রেখেছিল অনামিকা।

সেই 'উজ্জয়িনী' ওরফে রিকু খুন হয়ে গেছে!

অস্বাভাবিক রকমের এক তরুণীর খুনের ঘটনার খবর পুলিশ অফিসার প্রতুল গুপ্তের কাছ থেকে ও একটু আগে পেয়েছে। ওটাই সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরছিল। তবে সেই মেয়েটা যে রিকু-ই সেটা জানত না। পায়েলের চোখ ফেটে জল আসছে।

রিকুর জন্মের কয়েক বছর পর দীপককাকা বদলি হয়ে কলকাতা চলে গেলেন। তবে দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের সুতোটা ছিঁড়ে

◆ কে ছিল অন্তরালে ◆

"হ্যালো, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর পায়েল সেন বলছেন?"

"ইয়েস।"

অন্যপ্রান্তে একজন মহিলা কণ্ঠ। গলার স্বরে বেশ ভয় এবং উৎকণ্ঠার আভাস।

"আমি সুদেষ্ণা, আপনার সঙ্গে মাসখানেক আগে দেখা হয়েছিল আমাদের কলেজের একটি মোটিভেশন কোর্সের সেমিনারে, আপনি এসেছিলেন গেস্ট হিসেবে। মনে পড়ছে আপনার? তখন আপনার কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা চেয়ে নিয়েছিলাম। জানেন, আঁচল সুইসাইড করেছে। কেন করল বলতে পারেন? আপনি আসবেন, ম্যাডাম? প্লিজ আসুন! ঠিকানা বলে দিচ্ছি, ম্যাডাম। আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। প্লিজ, ম্যাডাম!"

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাঁফাতে হাঁফাতে মেয়েটি কথাগুলো বলে গেল। পায়েল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও খুব একটা লাভ হল না। অগত্যা মেয়েটির বাকি কথাগুলো পায়েল যতখানি পারল বেশ মন দিয়ে শুনে রাখল।

আঁচল নামটা খুব শোনা শোনা লাগছে। গত মাসে ইউনিভার্সিটির একটা মোটিভেশন সেমিনারে একটা ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল ঝকঝকে স্মার্ট বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একটি মেয়ে। ওই মেয়েটিই বলেছিল ওর নাম আঁচল। ওই মেয়েটি সুইসাইড করল না কি? শান্ত চেহারা, চোখে-মুখে বেশ আত্মবিশ্বাসের ছাপ, ওই মেয়ে কি এমন সিদ্ধান্ত নেবে?

অনামিকা এসে দাঁড়িয়েছে।

"কী ব্যাপার রে, পায়েল? কার ফোন ছিল?"

"সুদেষ্ণা নামে একটি মেয়ের। বলছে ওর বান্ধবী আঁচল সুইসাইড করেছে। বডি পোস্টমর্টেমে যাওয়ার আগেই আমাদের একবার যেতে হবে।"

"জায়গাটা কোথায়?"

"বালিগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছে, গুগল লাইভ লোকেশন পাঠাল। চল, এখনই বেরিয়ে পড়ি। বডি পোস্টমর্টেমে বেরিয়ে যাবে।"

গাড়িতে যেতে যেতে পায়েল বলে, "সুদেষ্ণা নামে মেয়েটা ভয়ে, দুঃখে বিহ্বল। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছিল।"

অনামিকা প্রশ্ন করে, "কখন সুইসাইড করেছে, কীভাবে করেছে এসব কিছু কি বলল?"

"বলল তো রাতের বেলায় পয়জন খেয়েছে। বাড়িতে নাকি কেউ ছিল না। এত কাঁদছে, বেশি কিছু বলতে পারছিল না। চল, গিয়ে জানা যাবে।"

অনামিকা বলে, "রাস্তার ওপরে এদিকে মুখ করে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখ, ওটা মনে হচ্ছে সুদেষ্ণা।"

"হুম, তাই তো মনে হচ্ছে।"

গাড়ি থামতেই মেয়েটি এগিয়ে আসে, "আসুন পায়েলম্যাডাম, এই গলিতেই বাড়ি। বডি এখুনি পোস্টমর্টেমে বেরিয়ে যাবে। পুলিশ কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।"

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে যায় পায়েল, কর্তব্যরত পুলিশকে ব্যাগ থেকে বের করে দেখায় নিজের ভিজিটিং কার্ড— প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর পায়েল সেন।

***

ইউনিভার্সিটির ক্যানটিনে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিল ওরা চারজন। আগামীকাল দয়িতার জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

আগামীকাল সন্ধ্যায় কে ফুল কিনবে, কে কেক নিয়ে যাবে সেইসব নিয়েই ওদের জোর আলোচনা চলছে। ওরা চারজন হল সুদেষ্ণা, আঁচল, সায়ক এবং প্রিতম। দয়িতা সহ ওরা পাঁচজন ফিজিক্সে এম.এসসি . পড়ছে। সবাই মিলে একজোট হয়ে বসে গ্রুপ ডিসকাশন, প্র্যাকটিকাল ক্লাস করে। বহুদিনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

সুদেষ্ণা হাসতে হাসতে বলে, "ওই দেখ, দোতলা বিল্ডিংয়ে দয়িতাকে দেখ। আমাদের খুঁজতে খুঁজতে পুরো বিল্ডিং চষে ফেলল, আমরা যে এখানে লুকিয়ে বসে ওর বার্থ-ডের সারপ্রাইজ গিফটের ছক কষছি, সেটা টের পায়নি।"

সায়ক বলে, "খুঁজতে খুঁজতে ঠিক চলে আসবে এখানে। তাড়াতাড়ি বল, কী গিফট কিনবি? তোরা মেয়েরা ঠিক কর। এই আঁচল, বল তুই কিছু।"

আঁচল যেন কিছু একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। খুব নিস্তেজ গলায় বলে,

"তোরা যা কিনবি তাতেই আমি রাজি।"

***

বেশ কিছুদিন ধরেই আঁচলের মধ্যে একটা নিস্তেজ, মনমরা ভাব লক্ষ করছে সুদেষ্ণা। ওর মধ্যে কালকের প্রোগ্রামে যাওয়ার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এমনিতে আঁচল খুব চাপা স্বভাবের, তবে ওর মিষ্টি ব্যবহারের জন্য সবাই ওকে খুব পছন্দ করে।

দয়িতার জন্মদিনে সবাই যখন নাচে-গানে-আনন্দে মশগুল, আঁচল তখন খুব সাধারণ সুতির হ্যান্ডলুম শাড়িতে এককোণে চুপচাপ বসে। সাধারণ বেশভূষাতেই ওর দিকে থেকে চোখ সরানো যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর ওকে আর দেখা যায় না।

পরদিন সকাল দশটায় ইউনিভার্সিটি যাওয়ার জন্য সুদেষ্ণা রেডি হচ্ছে, এমন সময় প্রিতমের ফোন,

"সুদেষ্ণা, কোথায় তুই? আঁচল সুইসাইড করেছে। তুই তাড়াতাড়ি আয়।"

চমকে ওঠে সুদেষ্ণা।

পড়িমরি করে ছোটে আঁচলের বাড়িতে। গিয়ে দেখে বাড়ির সামনে পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় জটলা। আঁচলের বাবা পেশায় অধ্যাপক। অনেক বিশিষ্ট মানুষজন এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রিতম, সায়ক আর দয়িতারাও রয়েছে। দয়িতা আলুথালুভাবে নাইট গাউনেই ছুটে চলে এসেছে। বোঝা গেল কালকের পার্টি শেষ হতে অনেক রাত হয়েছে, তারপর বেশ বেলা পর্যন্ত বিছানায় ছিল দয়িতা, ফোন পেয়ে ওই অবস্থায় ছুটে চলে এসেছে। ও কান্নাভেজা গলায় বলে ওঠে। "কী যে করে বসল আঁচলটা!" দয়িতা সুদেষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

সুদেষ্ণা কোনো কথা বলতে পারছে না। একটা লোহার বল যেন গলার কাছে আটকে আছে। আঁচলের ব্যক্তিগত জীবনটা বড়ো কষ্টের। ওদের মতো সর্বক্ষণ হুকুম চালানোর জন্য একজন মাতৃদেবী ওর ঘরে নেই। খুব ছোটোতেই আঁচল মা'কে হারিয়েছে। কে ওকে এত কষ্ট দিল যে ও আত্মহননের পথ বেছে নিল? সে কি অন্তরালেই থেকে যাবে?

হঠাৎ মুখের সামনে ভেসে উঠে উঠল একজনের মুখ। হ্যাঁ, সত্যানুসন্ধান করতে একমাত্র তিনিই পারবেন। ওরা শুনেছে তাঁর পারিশ্রমিক নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। তিনি আর কেউ নন, স্বনামধন্য প্রাইভেট

◆ ডাঃ রায়ের অন্তর্ধান রহস্য ◆

পায়েলের ড্রইং রুমে প্রতুল গুপ্ত স্যারের সঙ্গে জমিয়ে দাবা খেলতে বসেছে তোজো। মিসেস গুপ্তও এসে হাজির হয়েছেন স্যারের সঙ্গে। খেলা তো নয়, যেন যুদ্ধ চলছে। টিভি খোলা, মিসেস গুপ্তের টিভির চেয়ে বেশি নজর দাবার বোর্ডের দিকে। তোজো এ বাড়িতে আসার পর থেকে তোজোর টানে নিঃসন্তান এই গুপ্ত দম্পতির পায়েলের ফ্ল্যাটে যাতায়াত বেড়ে গেছে।

পায়েল ঘরে ঢুকতেই, ঠোঁট টিপে মুচকি হেসে দাবার বোর্ডের দিকে ইশারা করলেন গুপ্তগিন্নি। পায়েল দাবার বোর্ডে চোখ রাখে। তোজো বেশ চাপে ফেলে দিয়েছে প্রতুল গুপ্তকে, তিনি মাথা চুলকাচ্ছেন।

মন্ত্রী দু'ধাপ হটে গেছে, ব্যস তোজোকে আর পায় কে? অমনি কালো ঘোড়া আড়াই প্যাঁচে মোক্ষম চালে ঘায়েল করেছে সাদা রাজা আর সাদা নৌকাকে। পায়েলের সঙ্গে দাবা খেলে খেলে তোজো বেশ কিছু চাল রপ্ত করে ফেলেছে।

পায়েলের বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। মুখে বলে, "ছোটোরা দাবা ভালোই খেলে, প্রতুলবাবু; অনায়াসে বড়োদের পটকে দেয় কারণ ওদের মেমরি ব্যাঙ্কে স্টক কম থাকে তো। যেটা মেমরিতে থাকে অনায়াসে কাজে লাগায়। আর বড়োদের মেমরি কম্পিউটারের পুরোনো হার্ডডিস্কের মতোই অধিক মেমরিতে হ্যাং হয়ে যায়। ভেবে দেখুন তো, গ্যারি ক্যাসপারভ ত্রিশেই খেলা ছাড়ল কেন?"

হালে যেন কিছুটা পানি পেলেন প্রতুল গুপ্ত, "ঠিক ঠিক, বিশ্বনাথ আনন্দও তো ষোলো-সতেরোতে দুনিয়া কাঁপিয়ে ছিল।"

***

জলযোগ-পর্ব মিটলে আরও কিছুক্ষণ গল্পগাছা করে গুপ্ত দম্পতি বিদায় নিলেন। মানদামাসি এসে কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, "একদম বলতে ভুলে গেছি, একটা ছেলে তোমার খোঁজে এসেছিল দু'বার, শেষে দেখা না পেয়ে এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। বলেছে কাল আবার আসবে। তোমার ফোন নম্বর ওকে দিতে পারিনি। ভিজিটিং কার্ডগুলো তো অনেক খুঁজেও পেলাম না। কোথায় যে রাখো!"

পায়েল বলে, “কেন, আমার ড্রয়ারে ছিল তো!”

“দেখো দেখি, ছেলেটাকে বসিয়ে রেখে আমি ড্রয়ার ছাড়া সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে কত খুঁজলুম, কোথাও পেলুম না।”

অনামিকা ফোড়ন কাটে, “মানদামাসি, ভিজিটিং কার্ড যদি তুমি কিচেন ক্যাবিনেটে খোঁজো, তবে কী করে পাবে শুনি?”

পায়েল বলে, “কোথায় চিঠি? দেখি তো। আরে, এ তো পায়েলের রাইটিং প্যাডে লেখা চিঠি। মানদামাসি, এই চিঠি কি ছেলেটি এখানে বসে লিখেছে?”

“হ্যাঁ গো দিদিমণি, দু'বার এসেও যখন তোমার দেখা পেল না, তখন একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে খসখস করে চিঠি লিখে রেখে গেল তোমার জন্য। কাল বিকেলে ঠিক এই সময় আসবে বলে গেল।”

ছেলেটি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ গুছিয়ে চিঠি লিখেছে।

পায়েল ম্যাডাম,

আমি অর্কপ্রভ, ডাকনাম ঋভু, কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাড়ি কানপুরে, হোস্টেল থেকে পড়াশোনা করি। আমি আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত। আপনার প্রতিটি রহস্যের সমাধান আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। 'মুখার্জি ভিলা'র রিয়া-পিয়াকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ওদের কেসটা যেভাবে আপনি সমাধান করেছেন, সত্যিই আমি অভিভূত।

আপনিই পারবেন আমার স্যারকে খুঁজে বার করতে। ডক্টর রায় আমাদের মেডিকেল কলেজের সিনিয়র প্রফেসর। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি গ্রিনল্যান্ড নার্সিং হোমে নিজের চেম্বারে বসে রুগি দেখছিলেন। তারপর ওখান থেকে উধাও হয়ে যান। আমার দৃঢ় ধারণা তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এটি কোনো দুষ্কৃতীদের কাজ।

আমি আগামীকাল আবার আসব। এই হল আমার কনট্যাক্ট নম্বর।

ম্যাডাম, প্লিজ আপনি আমাকে সাহায্য করুন, যে করেই হোক আমার স্যারকে খুঁজে বের করে দিন।

ইতি,
অর্কপ্রভ

“অর্কপ্রভ বসু, দ্বিতীয় বর্ষের মেডিকেল কলেজের ছাত্র, নিবাস কানপুর। আগামীকাল আবার আসবে। তার আগে কিছুটা হোমওয়ার্ক করে রাখা প্রয়োজন।”

পায়েল ফেসবুক খুলে অর্কপ্রভ বসু, কানপুর... সার্চ করতে থাকে।

বেশ কয়েকজন অর্কপ্রভ বসুর নাম পাওয়া গেল।

একটিতে প্রোফাইল পিকচারে ফুলের ছবি। একটাতে এক মধ্যবয়েসী পুরুষ, চশমাধারী পুরুষ। অপর একটিতে স্বামী-স্ত্রীর যুগল ছবি।

পায়েল গলা তুলে বলে, "মানদামাসি, এদিকে একটু এসো, দেখো তো কোন ছেলেটা আজ বাড়িতে এসেছিল।"

পরপর কয়েকটি অর্কপ্রভ বসু নামে ছেলেদের ফটো দেখাতেই মানদা বলে উঠল, "দিদিমণি, এই ছেলেটা।"

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সাদা হাফ শার্ট কালো ট্রাউজার্স পরিহিত পাতলা ছিপছিপে উজ্জ্বল চেহারার উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে।

পায়েল ওর প্রোফাইলটা ভালো করে অবজার্ভ করে। বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবদের ফটোর সঙ্গে পারিবারিক কিছু ছবি আছে। কিছু ছবিতে অনিকেত বসু ও বিদিশা বসুকে ট্যাগ করা রয়েছে। মনে হচ্ছে তাঁরা ওর অভিভাবক।

পায়েল অনিকেত বসু এবং বিদিশা বসুর প্রোফাইল খোলে। অনিকেত বসু একটি নামী ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির এম.ডি.। চেহারায় চোখে-মুখে পেশাদারিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

বিদিশা বসু মিষ্টি চেহারার একজন সাদামাটা হাউজ-ওয়াইফ, নজরকাড়া সুন্দরী; গার্ডেনিং, কুকিং তাঁর হবি।

অর্কপ্রভ তাঁদের একমাত্র সন্তান। মুখের আদল এক্কেবারে মায়ের মতো। ছেলেটি ভালো ফুটবল খেলে। কলকাতায় হস্টেলে থেকে ডাক্তারি পড়ছে। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ওর প্রিয় অধ্যাপক ডক্টর শাশ্বত রায় নিরুদ্দেশ। অর্কপ্রভের ধারণা তিনি কিডন্যাপড হয়েছেন। কিন্তু কেন? তাঁর কি কোনো শত্রু আছে বা তিনি কি বিপুল সম্পত্তির মালিক? রাতারাতি কোথায় বা হাপিস হয়ে গেলেন এই ডক্টর রায়?

***

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে অর্কপ্রভ এসে হাজির হয়, পায়েল ঘড়ির দিকে তাকাল, নাহ্ ছেলেটার সময়জ্ঞান আছে। কাঁটায় কাঁটায় বিকেল চারটে। পায়েল ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল কিছুটা অবিন্যস্ত, কালো ফ্রেমের চশমার পেছনে ঝকঝকে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পরনে সাদা শার্ট, খাকি ট্রাউজার্স। খুবই সাধারণ বেশভূষা। চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। ফেসবুকের ছবির তুলনায় অর্কপ্রভ ওরফে ঋভুকে